এই সময়
সংবাদপত্র

কথাসরিৎ

দুঃখের আগুনে গ্লানি আবর্জনাই পোড়ে, ছাই হয়।
যা খাঁটি তা ছাই হয় না, পুড়ে শুদ্ধ হয়।
— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ

ধর্মীয় বিভাজন এবং সাম্প্রদায়িক ইন্ধন ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির একটি উদ্বেগজনক বাস্তব। কিন্তু এই ব্যাধিটির প্রশমন সম্ভব যদি রাজনৈতিক দলগুলি উদ্যোগী হয়। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, ধর্মকে রাজনৈতিক ফায়দার জন্য ব্যবহারে দলগুলি যতটা উৎসুক, তার ক্ষতিকর দিকটির নিয়ন্ত্রণে তারা ততটাই অনাগ্রহী। সম্প্রতি হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত একটি ধর্মীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের কণ্ঠে যে হিংসাত্মক বক্তব্য শোনা গেল, এবং তার পরেও প্রশাসন যে রকম নিরুত্তাপ, সেটি এই বাস্তবেরই একটি প্রকট এবং আশঙ্কাজনক উদাহরণ। যে দেশে সামান্য প্রতিবাদেই পুলিশ ইউএপিএ-র মতো দমনমূলক আইন চাপিয়ে দিতে সদা তৎপর, সেখানে সংবিধানে স্বীকৃত ধর্মাচরণের স্বাধীনতা লঙ্ঘনের আহ্বান সত্ত্বেও উত্তরাখণ্ডের পুলিশ প্রশাসনের তরফে বিন্দুমাত্র তৎপরতা দেখা গেল না। শাসক দল বিজেপি নীরব। একটি সভায় যখন ‘হিন্দুরাষ্ট্র’ নির্মাণার্থে দেশের অ-হিন্দু নাগরিকদের উপর সশস্ত্র হামলা এবং তাদের নিধনের ডাক দেওয়া হয়, বলা হয় মায়ানমার-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভারতেও ‘সাফাই অভিযান’ চালাতে হবে, সেই বক্তব্য দেশের সংবিধান অনুসারে শাস্তিযোগ্য। দুর্ভাগ্য এই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, আইন ও শিষ্টতার যাবতীয় সীমারেখা লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও এই হিংসার প্রচারকরা ছাড় পেয়ে যায়।

এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দেশকে কী ভাবে আচ্ছন্ন করে চলেছে, তার সাম্প্রতিক নিদর্শন অজস্র। গুরগাঁওতে শুক্রবারের নমাজে প্রতিনিয়ত বাধা তৈরি করা হচ্ছে, দেশের বহু রাজ্যে বড়দিনের সময় একের পর এক গির্জার উপর এবং উৎসবস্থলে হামলা চালিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এই প্রত্যেকটি ঘটনায় যেমন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে আক্রমণ চালানো হয়েছে, তেমনই আরও একটি বিষয়ও প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়— হামলাকারী ব্যক্তি বা সংগঠনগুলিকে মোকাবিলার ক্ষেত্রে পুলিশ বা রাজনীতিবিদ, কারও তরফেই বিন্দুমাত্র তৎপরতা দেখা যায়নি। অর্থাৎ প্রশাসনের তরফ থেকে পরোক্ষে একটি বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে, সংখ্যাগুরুর ধর্মের অজুহাতে আইন ভঙ্গ করলে শাস্তির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যে সমস্ত রাজনীতিবিদ কথায় কথায় নিজেদের দেশপ্রেমী বলে জাহির করেন, তাদের ভালোবাসার দেশের চেহারাটি কি এমনই ভয়াবহ?

মুক্তি

সমাজে বয়স্কদের প্রয়োজন কখন ফুরোয় সেটি জানার উপায় খোঁজা দরকার। সবাই একই ভাবে অন্তরালে প্রবেশ করবেন তা নাও হতে পারে। আড়ালে যাওয়াটি এক ধরনের অজ্ঞাতবাসে পরিণত হয়েছে। থাকবেন, অথচ উপস্থিতির কোনও সাড়া শব্দ মিলবে না। বৃদ্ধাশ্রমের রকমফের কর্মজীবনের সাফল্য-অসাফল্যের অনেকখানি প্রকাশ করে, তবে আধুনিক সভ্যতা তুল্যমূল্য শব্দটিকে কোনও একটি স্থির মাপকাঠিতে বাঁধেনি বলেই গোলমালের আশঙ্কা। করোনা পরিস্থিতিতে বৃদ্ধদের মনের খোঁজ নেওয়ার দায় কমেছে। কৈশোর, যৌবনের ওপর চাপ কমাতে হিমশিম সমাজের বেশির ভাগ অংশ। তাদের বাঁচাতে হবে, তাহলেই বাঁচবে সমাজ। কথাটি সর্বাংশে ভুল না হলেও, প্রবণতাটি যতখানি নির্মম, ততখানিই এক গণ্ডগোলের রাজনীতির পরিচয় বহনকারী। মানুষ একসঙ্গে বেঁচেবর্তে থাকা আর এক দলকে অদরকারি মনে করতে শিখছে, সেটি সভ্যতার কোন অংশটিকে আলাদা করে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়, তার চূড়ান্ত হদিশ এখনও না মিললেও, সকলের শরীর-মনেই যে স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন রেখে যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৃদ্ধ পিতামাতাদের রাস্তা থেকে উদ্ধার করছে পুলিশ। কখনও স্মৃতিভ্রংশদের শহরতলিতে রেখে যাচ্ছে সন্তান। অতিমারী থেকে মুক্তির কথা হচ্ছে চারদিকে, রোগ সত্যিই সেরেছে তো?

অসংখ্যা

২৫০০০০

(আড়াই লক্ষ) ডলার — বিশ্বের সব থেকে দামি বেল্ট গুচ্চি স্টুয়ার্ট হিউজ বেল্টের মূল্য। সূত্র: এক্সপেনসিভ-ওয়ার্ল্ড ডট কম

দিনকেদিন

২৯ ডিসেম্বর

১৯৪২: হিন্দি চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা রাজেশ খান্না জন্মগ্রহণ করেন। ২০১৩ সালে তিনি পদ্মভূষণ পুরস্কার পান। বিখ্যাত ছবি ‘আরাধনা’, ‘আনন্দ’ ইত্যাদি।

২০১২: টনি গ্রেগ প্রয়াত হন। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার ও পরে ধারাভাষ্যকার হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেন। ৫৮টি টেস্ট ম্যাচে তাঁর ৮টি শতরান আছে।

মহাপুরুষ

স্বামী সারদানন্দ

বোধিবৃক্ষ

‘আমি’ ও ‘তুমি’- এ দুটি পৃথক ভাব জীবনে প্রথমেই শিক্ষা হয়; আবার এই দুই বস্তু এতই বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন যে এ দুটিতে গোল হবার আদৌ সম্ভাবনা নেই। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ বোধ হয় ঐ দুটি শব্দ হতে যত হয়েছে, এত আর কিছুতে হয়নি। ভক্ত বলেন— ‘ঠাকুর! আমি কিছু নই, তুমিই সব। রোগে-শোকে জর্জরীভূত, কাম-ক্রোধে উন্মত্তপ্রায়, যশ-মানের কাঙ্গালী, বায়ুর ন্যায় অস্থির-মতি— এ ‘আমি’র আবার শক্তি আছে? এ ‘আমি’র দ্বারা আবার সাধন হবে, ভজন হবে— তোমায় পাব? জলে শিলা ভাসা, বানরের সঙ্গীত, আকাশ-কুসুমও কোন কালে সত্য হতে পারে; কিন্তু এই নগণ্য ‘আমার’ শক্তি আছে এবং সেই শক্তিতে তোমায় ধরব— ইহা কখনও সম্ভব না। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, সর্বস্ব ধন; তোমার যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক। ভক্ত দেখেন এই মহান্ ‘তুমি’— যাঁর নিয়মে সূর্য-তারকা ফিরছে, অগ্নি জ্যোতি দিচ্ছে, মৃত্যু সমুদয় গ্রাস করছে। ভক্ত দেখেন, সেই ‘তুমি’ আবার প্রাণের প্রাণ, নয়নের জ্যোতি, বাহুর শক্তি; প্রেমই তাঁর স্বরূপ, তিনি পরম সুন্দর! যে সৌন্দর্যের কাছে আর সকল সৌন্দর্য অন্ধকারে পরিণত, সে বীর্যের কাছে অন্য সকলের বীর্য পরাহত। এই মহান তুমি— নিকট হতেও নিকটে, আপনার হতেও আপনার। মোহিত স্তম্ভিত হয়ে ভক্ত এঁকেই ইষ্টদেব বলে বরণ করেন এবং ‘তুমি’-নাম-মহামন্ত্রে মহোৎসাহে দীক্ষিত হন।

(‘গীতাতত্ত্ব ও ভারতে শক্তিপূজা’ থেকে গৃহীত)

নির্বাচনী চর্চায় এটি প্রমাণিত যে শুধুমাত্র রিগিং, ছাপ্পা ভোট আর হিংসার মাধ্যমে ভোটে জেতা যায় না

অনলাইন ভোট নিয়েও ভাবুক নির্বাচন কমিশন

ভোটের পরই পরাজিত পক্ষের তরফে নির্বাচনী কারচুপি নিয়ে অভিযোগ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা সত্য হোক বা না হোক, বিকল্প পথ খোঁজা জরুরি। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

সুদীপ্ত দাস

কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের মতো আপডেট করা হয় না। সরাসরি ফলাফল দেখা যায় না। খোঁজ নিয়ে দেখলে জানা যায় যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে লোকবলের অভাব। কমিশনে বহু শূন্য পদে নিয়োগ করা হয়নি। যার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনের যে পরিমাণ দক্ষতা থাকার কথা তা থাকছে না। ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গেলে সংবাদপত্রে বা টেলিভিশন চ্যানেলের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু গবেষণামূলক কাজের জন্য তা বিশুদ্ধ তথ্য নয়। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনেক বেশি খাঁটি।

বিরোধী দলের তরফ থেকে অনেক সময় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে যে কোনও নির্বাচন (পঞ্চায়েত ও পৌরসভা) হলে গেল-গেল রব তোলা হয়। হয় রিগিং না হয় ভোটে অসম্ভব কারচুপির অভিযোগ ওঠে পরাজিত পক্ষের তরফে। হেরে গেলে বিজয়ীদের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগের ধারা সেই বামফ্রন্ট আমল থেকে ধারাবাহিক ভাবে চলছে। এমনকী ফলাফলের দিন টেলিভিশনে বিজিত পক্ষ বিজয়ীদের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করে। কিন্তু অন্তত যে দিন জনগণের রায় বেরোয়, সে দিন মাথা নত করে বিনম্র ভাবে হার স্বীকার করার পরিপক্কতা আজকাল দেখা যায় না। হারের কারণ অনুসন্ধান করা এবং সেই বিষয়ে কী করণীয়, তা নিয়ে তাদের দলের কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ ভোটারদের কাছে কোনও বার্তা দেয় না। যাঁরা সেফোলজি চর্চা করেন, তাঁরা জানেন যে শুধু রিগিং করে একটি নির্বাচনে জেতা যায় না। বিরোধী পক্ষের ভোটার কেন ভোট দিতে যান না? বুথ স্তরে কেন একটি দল পোলিং এজেন্ট দিতে পারে না? সাংগঠনিক শক্তি কেন একটি নির্বাচনে জোরদার থাকে আর ঠিক তার পরে আর একটি নির্বাচনে একদম ধ্বংস হয়ে যায়? নির্বাচন চর্চার ক্ষেত্রে এইগুলো গুরুতর প্রশ্ন।

কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে এইবার ৬৩.৫৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। ২০১৫ সালের নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৬৮.৫০ শতাংশ। অর্থাৎ গতবারের তুলনায় ৫ শতাংশ ভোট কম পড়েছে। ফল বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে বিজেপি মাত্র ৯.১৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে আর বামফ্রন্ট বিজেপির থেকে বেশি ভোট পেয়েছে। তাদের ভোটের শতাংশের হার ১১.৮৯ শতাংশ। আসন সংখ্যার বিচারে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস, বিজেপি আর নির্দল, সবাই প্রায় সমান। তৃণমূল রেকর্ড পরিমাণ ভোট পেয়েছে ৭২.১৩ শতাংশ আর আসন সংখ্যার বিচারে নতুন রেকর্ড— ১৩৪টি আসন। ২০১৫ সালের তুলনায় পাঁচ শতাংশ ভোট কম পড়ার একটা ব্যাখ্যা হল যে বিজেপির উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ভোটাররা এইবার ভোট দিতে যায়নি। গত দু’তিন দশকে কলকাতার জনবিন্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। কলকাতার উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তর মধ্যে এখন অনেক অবাঙালি ভোটার। সেই অবাঙালি বিজেপি ভোটার এইবার তেমন ভোট দিতে যায়নি যতটা ২০১৪ সালের লোকসভা, ২০১৫ সালের পৌরসভা, ২০১৯ সালের লোকসভা ও ২০২১ সালের বিধানসভায় ভোট দিতে গিয়েছিল। কারণ হেরো পার্টির পক্ষে কেনই বা তারা ভোট দিতে যাবে। আরএসএস-এর শাখায় শিক্ষিত না হলে ভোটের গুরুত্ব কী, তা কি বুঝবে আজকের দিনের নতুন প্রজন্ম? যে নতুন প্রজন্মের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ২০১৪ সাল থেকে বিজেপির দিকে ঝুঁকছিল, সেই নতুন প্রজন্মের একটি বড় অংশের বিজয়ীদের পক্ষে থাকার একটা প্রবণতা আছে।

অন্য দিকে বামফ্রন্টের মধ্যে একটি মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা আছে। তাই তারা ভোটে হারুক বা জিতুক, তাদের কর্মী ও সমর্থকরা নিরলস পরিশ্রম করে সারা বছর। গত দুই বছর শ্রমজীবী ক্যান্টিন ও রেড ভলান্টিয়ার্স মারফৎ সামাজিক ক্ষেত্রে তারা মানুষের কাছে পৌঁছোবার প্রচেষ্টা করেছে। যার ফল তারা এই নির্বাচনে কিছুটা পেয়েছে। এই নির্বাচন থেকে বামফ্রন্ট একটা শিক্ষা নিতে পারে যে বাম ঐক্যের লাইন ঠিক। আগামী পৌরসভা নির্বাচন ও ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা এই লাইনে কায়েম থাকলে ঠিক করবেন। তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সঠিক ভাবে ‘বিজেমূল’ নামক ভ্রান্ত বুলি আউড়াতে নিষেধ করেছেন। এই বিষয়ে তাদের নেতা-নেত্রীরা সচেতন থাকলে ভাল করবেন। বামফ্রন্টের যাঁরা প্রতিনিয়ত টেলিভিশনের পর্দায় মুখ দেখান, তাঁরা আগের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ইস্যুভিত্তিক প্রচার আন্দোলনে থাকলে আগামী দিনে বামফ্রন্টের শক্তি মজবুত হতে পারে। তবে ধৈর্য ধরতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর নব্য-বামপন্থী রাজনীতির ইস্যু প্রত্যেক দিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে উঠে আসবে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে আপাতত বামফ্রন্ট বাদ দিয়ে অন্য কোনও রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম সেই রাজনীতি করতে অপারগ। নব্য ও মধ্য-বাম ঘরানার রাজনীতির যা ইস্যু আছে, তা নিয়ে তৃণমূল অনেকটা কাজ করছে। ফলে বামফ্রন্টকে বাম রাজনীতি করতে গেলে তৃণমূলের তুলনায় আরও বাম ঘেঁষা রাজনীতি করতে হবে এবং তা পুরাতন নকশাল ঘরানার রাজনীতি নয়। কারণ সেই রাজনীতির সমস্ত সম্ভাবনা সাতের দশকে শেষ হয়ে গেছে।

> বিজেপির এহেন অবস্থা হবারই ছিল। কারণ তারা বড্ড বেশি সেলিব্রিটি মার্কা রাজনীতি করতে গিয়েছিল। যারা বুথ স্তর থেকে বছরের পর বছর খেটেছে, তাদের প্রতি অন্যায় হয়, যদি উড়ে এসে জুড়ে বসা সেলিব্রিটিরা ছড়ি ঘোরায়।

অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির মধ্যে মুষলপর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এহেন অবস্থা হবারই ছিল। কারণ তারা বড্ড বেশি সেলিব্রিটি মার্কা রাজনীতি করতে গিয়েছিল। বামফ্রন্ট ও বিজেপি, দুই পক্ষই মতাদর্শগত রাজনীতি করে। তাদের সেলিব্রিটি-নির্ভর রাজনীতি শোভা পায় না। যারা বুথ স্তর থেকে বছরের পর বছর খেটেছে, তাদের প্রতি অন্যায় হয়, যদি উড়ে এসে জুড়ে বসা সেলিব্রিটিরা ছড়ি ঘোরায়। পশ্চিমবঙ্গে সেলিব্রিটিদের দেখলে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়। অনেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পড়তি কেরিয়ারের সময় হঠাৎ করে রাজনীতিকে একটা নতুন কেরিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলেন। অনেকে সুবিধাবাদী হয়ে চিরজীবনের মতো পেনশন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করল। কিন্তু দল যখন বিপদে পড়ে তখন সেই সমস্ত সেলিব্রিটিদের খুঁজে পাওয়া যায় না। ২০১৪ সাল থেকে বিভিন্ন নির্বাচনে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে এই উপলব্ধি হয়েছে যে বেশির ভাগ সেলিব্রিটি তাদের কেন্দ্রে সময় দেন না। আর লোকসভা-বিধানসভায় তাদের উপস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন দলের নেতৃত্ব যথেষ্ট চিন্তায় থাকেন। তথাকথিত সেলিব্রিটিদের ‘পলিম্যাথ’ বলতে গেলে সংকোচ হয়। কারণ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙালি ‘পলিম্যাথ’রা যেমন অনেক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, একবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সেলিব্রিটিরা, নিজেদের জায়গায় যত সময় দেবার প্রয়োজন ছিল, তা না করে রাজনীতি আর শিল্প-ছলা-কলা-নাটক-অভিনয়-কবিতার মধ্যে কোনটা বেশি প্রয়োজন তা ঠিক করতে পারেন না। আর তা পারেন না বলেই তাঁদের সমস্যা অনেক সময় দলের সমস্যা হয়ে যায়। আর সেই দল শাসক হলে সরকারেরও সমস্যা হয়। পশ্চিমবঙ্গের এক প্রবাদপ্রতিম গায়ক ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জেতার পরে এক সাংবাদিককে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন ২০১০ সালে। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর দল সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করেছিলেন। তার পর দলের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর যোগাযোগ আর দূরত্ব ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত লক্ষ করা যায়। যাই হোক, সেই ২০১০ সালের সাক্ষাৎকারে তিনি একটি খাঁটি কথা বলেছিলেন। ‘রাজনীতি একটি চর্চাসাপেক্ষ বিষয়। এক দিনে দুম করে হয় না’। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে আজ আপনি সিনেমা বা সিরিয়ালের নায়ক-নায়িকা আর পরের দিন আপনি রাজনীতিবিদ, কাল আপনি ফ্যাশন ডিজাইনার আর পরশু আপনি রাজনীতিবিদ, এই সব আর যেখানে হোক, পশ্চিমবঙ্গে হয় না। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে হলেও হতে পারে। কিন্তু বঙ্গীয় রাজনীতির সংস্কৃতির মধ্যে এই সব অচল। দুর্ভাগ্য, তাঁর দল তাঁর উপদেশে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি। ২০১৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি যে পরিমাণ সেলিব্রিটি-নির্ভর হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে অনেক সময় সাধারণ ভোটার, এমনকী দলীয় নেতৃত্ব পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে পড়ছে।

ভারতের ভোটিং মেশিন হার্ডওয়্যার দ্বারা চালিত যা কারচুপি করার সম্ভাবনা প্রায় নেই। তাই ভোটের মেশিনে কারচুপি হয় আর ফলে কোনও একটি দল হেরে যায়, তা একটি বোকা তত্ত্ব। বড়জোর কর্মী-সমর্থকদের সান্ত্বনা দেবার কাজে লাগে। তার বেশি নয়। কিন্তু ভোটে গোলমাল এড়াতে গেলে বা ভোট দিতে ভয় পেলে ই-মেল মারফৎ ভোট দেওয়া যেতে পারে কিনা সেটা ভারতের নির্বাচন কমিশন ভেবে দেখতে পারে। যেহেতু আধার কার্ডের সঙ্গে একটি করে ই-মেল ও ফোন নম্বর যুক্ত থাকে তাই ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড দ্বারা অনলাইন ভোট দেবার একটা প্রক্রিয়া চালু রাখা যেতে পারে। সফটওয়্যার সুরক্ষিত রাখার জন্য যা করণীয় তা করা যেতে পারে। যাঁরা অফলাইন ভোট দিতে চান তাঁরা পাড়ার বুথে গিয়ে ভোট দিতে পারেন আর যাঁরা অনলাইন ভোট দিতে চান তাঁরা ই-মেল যুক্ত আধারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। তাতে আগামী দিনে বুথের সংখ্যা কমে যেতে পারে। সরকারি খরচ কমতে পারে। বয়স্ক মানুষের বুথ পর্যন্ত গিয়ে ভোট দেবার পরিশ্রম করতে হবে না। মারপিট, গণ্ডগোল কম হবে। অনেক সহজে শান্তিপূর্ণ ভোটদান সম্ভব হবে।

ভারতে নির্বাচন-কেন্দ্রিক হিংসা বাড়ছে। এবং সেই হিংসা আগামী দিনে কমার সম্ভাবনা নেই। কারণ একটি ভোটে জেতা-হারার উপরে নির্ভর করে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার হিসেব নিকেশ। নির্বাচন-কেন্দ্রিক হিংসা যে হারে বাড়ছে, তা এড়াতে গেলে বাড়িতে বসে ভোট দেবার উপযোগিতার কথা ভাবা যেতে পারে।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

ইন্টারনেটই এখন পাচারের ফাঁদ

অতিমারীর সময় ইন্টারনেটের মাধ্যমে নারী পাচার এবং শিশুদের যৌন শোষণ বিশ্বজুড়ে এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। লিখছেন **ঋষিকান্ত**

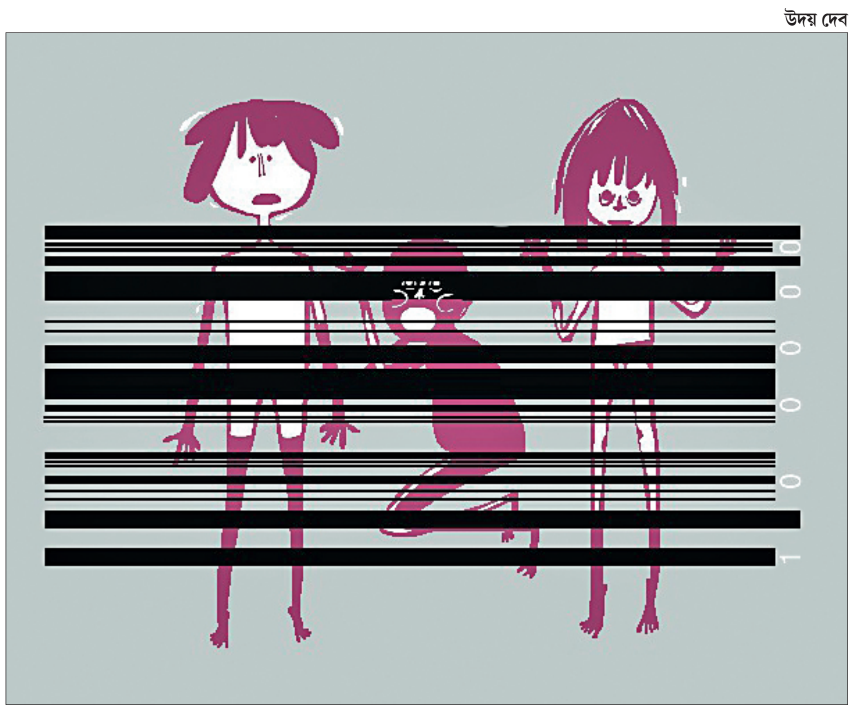

উদয় দেব

ইন্টারনেট এক ইন্দ্রজাল। সেই জাল কেটে বেরিয়ে আসার কোনও উপায় এখন আর আমাদের হাতে নেই। বরং যত দিন যাচ্ছে, তার উপর নির্ভরতা ক্রমশই বাড়ছে। আর সেটাকেই কাজে লাগাচ্ছে এক শ্রেণির অসাধু মানুষজন, যাদের আমরা মানব পাচারকারী বলে চিনি। তারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়ে প্রথমে ফাঁদ পাতছে, তার পর টোপ দিচ্ছে, তার পর ‘শিকার ধরছে।’ এ ভাবেই কোভিড-১৯ এবং তার পরবর্তী সময়ে ফুলেফেঁপে উঠছে তাদের নোংরা ব্যবসা।

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টেলিগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে এই অসাধু লোকেরা ব্যবহার করছে, মূলত কিশোরীদের সঙ্গে বন্ধু পাতাতে। তার পর তাদের সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তাদের সঙ্গে অনলাইনে বা অফলাইনে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করছে। অনলাইন সংক্রান্ত যে সব মানবপাচারের মামলা এখনও পর্যন্ত সামনে এসেছে, তাতে দেখা গিয়েছে, একটু একটু করে ছদ্ম পরিচয়ে প্রথমে সে কিশোরীর সঙ্গে (কোনও কোনও ক্ষেত্রে কিশোর) সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে। বন্ধুত্ব থেকে প্রেম। তার পরেই ভালো কাজ, ভালো থাকা, বিয়ের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদির টোপে অন্য রাজ্যে নিয়ে গিয়ে নানা অসামাজিক কাজে তাদের ব্যবহার করা হয়েছে। তা হতে পারে যৌনকর্মী হিসেবে, ফোর্সড ম্যারেজ ইত্যাদি। এই মেয়েরা কে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে (ভালনারেব্‌ল) আছে, সে হোমওয়ার্ক পাচারকারী বা আড়কাঠিরা আগেই করে রেখে। সেই মতো জাল বিছায়।

এই প্রবণতা কোভিড-১৯ ও তার পরবর্তী সময়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কারণ স্কুলের জন্য হোক বা গৃহবন্দি থেকেই হোক, বাচ্চারা এখন অনেক অনেক বেশি সময় ইন্টারনেটে কাটাচ্ছে। আর তা পাচারকারীদের জন্য আশীর্বাদ। তারা খুব সহজেই শিকার ধরতে পারছে। ফাঁদ পাতাও সহজ হয়ে গিয়েছে। বহু মামলায় দেখা গিয়েছে, ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে যোগাযোগ করে বহু নাবালিকাকে এ ভাবে যৌন পেশায় আনা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আন্তঃরাজ্য বা আন্তর্জাতিক অনলাইন পাচারচক্রকে পুলিশ ভাঙতে পেরেছে।

তবে শুধু মেয়েদের টোপে ফেলে যৌন পেশা বা অন্য অসামাজিক কাজে নামানোই নয়, কাস্টমার বা খদ্দেরও পাচারকারীরা ধরছে এই অনলাইনে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই। প্রথমে মেয়েটির খোলামেলা ছবি বা ভিডিয়ো দেখানো হচ্ছে, যা মেয়েটি এক সময়ে তার সঙ্গে অনলাইনেই শেয়ার করেছিল। তার ভিত্তিতে দাম ঠিক হচ্ছে। দরদামের পর তা নিশ্চিত হলে আসছে টাকাপয়সার লেনদেন। তাও লোকেশন ধরে হচ্ছে ও অনলাইনে মুহূর্তে টাকা পেয়ে যাচ্ছে পাচারকারী। এর ফলে তাদের ধরা পড়ার সুযোগও কম।

এখন দেখা যাচ্ছে, এই পাচারের অবৈধ ব্যবসা আর শুধু যৌনপল্লি কেন্দ্রিক নেই, তা স্পা, ম্যাসাজ পার্লার, ফ্ল্যাট ও হোটেলেও জমিয়ে হচ্ছে। এবং এই সবগুলোই কিন্তু বসতি অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। ফলে এখন আর আলাদা জায়গা নয়, খাস লোকালয়ের মধ্যেই রমরমিয়ে চলছে এই কারবার! তাই সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে এই সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। কিছু সন্দেহ হলে জানাতে হবে পুলিশকে।

তবে শুধু পাচারই নয়, শিশুদের যৌন শোষণের জন্যও ব্যবহার করা হচ্ছে অনলাইনকে। যা পুলিশের জন্য বিরাট মাথাব্যথার কারণ। এ বিষয়ে রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। এবং তা প্রতিরোধ করার উপায় তাদের জানা নেই। কারণ বাচ্চাদের এখন অনলাইন পড়াশোনা হয়, তাই ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় বা তাদের হাত থেকে মোবাইল নিয়ে নেওয়া বা কম্পিউটার ব্যবহার করতে না দেওয়াও অসম্ভব। আর সে জন্যই এই সব বাড়ছে।

একটা পরিসংখ্যান দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। ২০১৭-২০২০ সাল পর্যন্ত ২৪ লক্ষ শিশু যৌন শোষণের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে ৮০ শতাংশ হচ্ছে মেয়ে যাদের বয়স ১৪ বছর বা তার কম। কাজেই এখান থেকেই স্পষ্ট কী ভাবে বাচ্চাদেরকে শিকার বানানো হচ্ছে আর বয়ঃসন্ধির মেয়েরা কী ভীষণ বিপদের মধ্যে রয়েছে।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। সম্প্রতি সিবিআই ১৪টি রাজ্যের ৭৭টি জায়গায় হানা দেয়। তাদের কাছে খবর ছিল সবগুলি ক্ষেত্রেই অনলাইনের মাধ্যমে বাচ্চাদের যৌন শোষণ চলছে। কয়েক জনকে আটকও করা হয়। তাদের থেকে জানা গিয়েছে, এ রকম ৫ হাজার লোক রয়েছে, যারা এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে এর জাল বিছিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সিবিআই ২৩টি এফআইআর করে মোট ৮৩ জনের বিরুদ্ধে। তার তদন্ত চলছে।

তাই শিশুদের ইন্টারনেট সুরক্ষা খুবই জরুরি। মানবপাচার ও যৌন নিগ্রহ থেকে তাদের বাঁচাতে নজরদারির প্রয়োজন। বাচ্চা কোন সাইট দেখছে, কাদের সঙ্গে বন্ধু পাতাচ্ছে, এর ফলে তাদের মধ্যে কোনও আচরণগত পরিবর্তন আসছে কি না, হলে তা কী — এ সবের উপর অভিভাবকদের নজর দিতেই হবে। কারণ এটা এমন একটা বয়স, যখন অনেক কিছুই হাতছানি দেয়, ‘অ্যাডভেঞ্চার’ মনে করে তারা তা লুফে নেয়। আর সেখানেই ঘটে যায় মারাত্মক বিপদ। সে জন্যই সতর্ক করা উচিত বাচ্চাদের, তাদের এই বিপদ বোঝাতে হবে। এবং একই সঙ্গে সতর্ক থাকতে হবে মা-বাবা বা অভিভাবককে, সন্তানকে রক্ষা করার জন্য।

লেখক মানব-পাচার বিরোধী আন্দোলনের কর্মী

প্রতি সম্পাদক

এএনআই

মানুষ খুন করে মোক্ষলাভ হয়?

হরিদ্বারে এক ধর্মীয় সভায় হিন্দুরাষ্ট্রের দাবিতে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা হয়েছে। সেই সভায় উপস্থিত মানুষদের কেউ স্বামী, কেউ সাধ্বী, কেউ মহারাজ উপাধিতে পরিচিত। তাঁরা এখন আর ঈশ্বরসাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাই তাঁরা এখন তাঁদের মতো করে রাষ্ট্রের দাবি তুলেছেন। হিন্দু ধর্মে মানুষকে খুন করে মোক্ষলাভ হয় কিনা, তা তাঁরাই জানেন। তবে বিবেকানন্দের কথা হয়তো তাঁরা জানেন না। স্বামীজি বলেছিলেন, ‘সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করিতে থাকো। তোমরা যে নিজদিগকে ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া খাঁটি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকো, উহা ছাড়িয়া দাও।’ না, এই সাধুগণ ‘হিন্দু বলিয়া’ গর্ব করিতে ছাড়িতে পারেন না। তাই প্রয়োজনে অস্ত্র ধরার হুমকি দিতেও কুণ্ঠিত হন না। আর তাঁরা কুণ্ঠিত হবেনই বা কেন। তাঁরা জেনে ফেলেছেন যে হিন্দু ধর্মই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অথচ বিবেকানন্দ এক আলোচনার জবাবে বলেছিলেন, ‘হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরীব ও পতিতদের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোনো ধর্ম এরূপ করে না’। বিবেকানন্দ এমন কথা বলেছেন বলে কি তিনি হিন্দু ছিলেন না! অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার হুমকিদায়ী সাধুগণ অবশ্য তা বলতে পারেন হয়তো।

বাবরি মসজিদ ভাঙার ইতিহাস সবার জানা আর এখন মন্দির গড়ারও সাক্ষী সবাই। সবাই দেখেছে, কী ভাবে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপে সেই ইতিহাস গড়ে উঠছে আর সেই ইতিহাস ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। আসলে রাষ্ট্রই এখন মনে করে এ দেশ হিন্দুদের, যা হরিদ্বারের ওই সাধুদের হুঙ্কারে ব্যক্ত হয়েছে। প্রাক-স্বাধীনতা আমলে হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, ‘সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠিয়েছেন। ত্রিশূল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দু মাত্রেই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। হিন্দু মাত্রেরই এর নিন্দা করা কর্তব্য।’ রাজনীতিতে ধর্মের সুযোগ নেওয়া যেমন ধর্মকে কলুষিত করে, তেমনই ধর্মে রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটলেও ধর্ম কলুষিত হয়। আজকে যদি এই দুটোই কলুষিত হয়ে হাত ধরাধরি করে চলে তখন রাষ্ট্রের চরিত্রও কলঙ্কহীন, পক্ষপাতহীন হতে পারে না।

নরেন্দ্রনাথ কুলে, কলকাতা ৩৪